মহান মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ও বাম-পন্থী'দের অবদান

প্রকৌশলী মুকুলের সাথে কথা হচ্ছিল ঈদের দিন। মুকুল ঢাকার খিলগা'য় বড় হয়েছে, মুকুলের অভিযোগ আমার লেখায় কেন **মুক্তিযুদ্ধে বাম-পন্থীদের (বিশেষত চীন পন্থীদের)** অবদান এর কথা উল্লেখ করি না বা তাদের অবদানের কথা কেন বলা হয় না? যেমন শহীদ বাকী সহ খিলগা এলাকার পল্লিমা সংসদের সাথে জড়িত সব মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, যারা মুক্তিযুদ্ধের আগে হলুদ পাঞ্জাবী পরে গনজাগরনের গান পরিবেশন করতেন, তাদের কথা। ঈদের দিন, অনেক মানুষের মধ্যে এই প্রসংগ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করা সম্ভব ছিল না তাই '**মুক্তিযুদ্ধে বাম-পন্থীদের** অবদান' এর প্রসংগ, আজকের এই লেখার মূল বিষয়।

প্রেক্ষাপটঃ এই প্রসঙ্গে আলাপ করতে গেলে আমাদের কয়েক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে। ৭০ দশকের শেষদিকে, ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন'ই ছিল দেশের প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন। পরে ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'এর জন্ম হয়। ছাত্র ইউনিয়ন' ছিল রুশ প্নন্থী এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন' ছিল চীন পন্থী। র্বতমান মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রমূখ ছিলেন (রুশ পন্থী) ছাত্র ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে। অন্যদিকে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'এর নেতা ছিলেন রাশেদ খান মেনন। সব্বহারা পার্টির সিরাজ শিকদার'ও এই বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'এর সহ সভাপতি ছিলেন। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন' ছিল মাওলানা ভাসানী এবং ভাসানী ন্যাপ এর অনূসারী চীন পন্থী ছাত্র সংগঠন।

মুক্তিযূদ্ধঃ ১৯৭০ সালের নিব্বাচনে একদিকে আওয়ামী লিগের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা র্অজন ও অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপের নিব্বাচনে অংশগ্রহন না নেওয়ার ফলে জাতীয় পররযায়ে মাওলানা ভাসানী ছাড়া ন্যাপের আর কোন উল্লেখ যোগ্য নেতা ছিল না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরে হলে, পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বন্ধু চীন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পক্ষ নেওয়াতে আমাদের দেশের চীনপন্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

তখন পরিস্থীতী এমন দাঁড়ায় যে, সব দল 'হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অথবা বিপক্ষে"। দলের প্রধান, দেশপ্রেমিক মাওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে গমন করেন। অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপের অধিকাংশ নেতাই বাংলাদেশের ভিতরেই অবস্থান গ্রহন করেন। এই অংশের নেতা মশিউর রহমান যাদু মিয়া, মাওলানা ভাসানী'কে দেশে ফিরিয়ে আনতে এমনকি ভারত গমন করেন। ভাসানী দেশে ফিরতে অসম্মতি জানালে, যাদু মিয়া "ভাসানী'কে ভারতে আটকে রাখা হয়েছে বলে অপপ্রচার চালান।

এই রকম পরিস্থীতিতে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'এর বিরাট অংশ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এই অংশের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন, আব্দুল মান্নান ভুইয়া'র (প্রাক্তন বি, এন, পি মহাসচিব) নেতৃত্বে সাদেক হোসেন খোকা (ঢাকার মেয়র), বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ বাকী, এবং শিল্পী ফকির আলমগীর প্রমুখ। এখানে বলা প্রয়োজন ছাত্র ইউনিয়ন এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'এর সর্মথন মূলত ছাত্রদের মধ্যে এবং ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল। ১৯৭০-৭১ সালে ব্যাপক জনসাধারনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সর্মথন ছিল একচেটিয়া। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ'ই ছিল একাত্তুরের মূলধারা।

বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও স্বীকৃতিঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ছিলেন বেসামরিক ব্যাক্তিত্ব (৯০,০০ এর মত, মূলত ছাত্র এবং কৃষক, শ্রমিক) এবং বাকী অংশ ছিল সামরিক ব্যাক্তিত্ব (পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ই পি আর, আনসার থেকে আগত প্রায় ২০ হাজার সদস্য)। যুদ্ধকালে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৯৫ ভাগই ছিলেন এই অসামরিক ব্যাক্তিত্ব। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী'র বেশ কয়েকজন ঊর্ধতন র্কমর্কতা ও প্রাক্তন সেক্টর কমান্ডার'দের মতে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মূল কারন, এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন প্রচন্ড সাহসী কিন্তু আবেগ র্নিভর, বয়সে তরুন, পররযাপ্ত সামরিক প্রশিক্ষন এবং সামরিক অভিজ্জতার অভাব।

অথচ আমরা যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহসীকতার জন্য প্রদত্ত পদক তালিকা দেখি তা হলে আমরা এইসব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের তেমন কোন প্রতিফলন দেখতে পাই না। সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ'র মধ্যে একজনও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাও নাই! অনেক বীর উত্তমের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আছেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। সব সেক্টর কমান্ডার'কে ঢালাও ভাবে (র্কনেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম এর ভাষায় 'খয়রাতি') বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত যুদ্ধভিত্তিক প্রায় সব জনপ্রিয় বই' এর লেখকই প্রাক্তন সামরিক ব্যাক্তিত্ব। তারাও তাদের বইয়ে এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন। এই সব অজানা বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব নিয়ে লেখা দুইটি বইয়ের ('একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম, 'জনযুদ্ধের গনযোদ্ধা', মেজর কামরুল ইসলাম ভুইয়া) লেখক'ও প্রাক্তন সামরিক ব্যাক্তিত্ব। শুধুমাত্র এই দুইটি বই পড়লেই বুঝা যায়, এই রকম কত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গেও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী'র বেশ কয়েকজন ঊর্ধতন র্কমর্কতা ও প্রাক্তন সেক্টর কমান্ডার'দের অভিমত হল, এটা ইচ্ছাকৃত নয় এবং খুবই র্দূভাগ্যজনক। তাদের ব্যাখ্যা হলো যেহেতু, এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা কোন সেনা ইউনিটের সরাসরি সদস্য ছিলেন না, তাই তাদের বীরত্ব লিপিবদ্ধ করা তো দুরের কথা, তাদের নাম-ঠিকানাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংরক্ষন করা হয় নাই। তাই তাদের বীরত্ব আর ত্যাগের স্বীকৃতি'র কথা কখনোই জনসমক্ষে যথাযথ ভাবে প্রকাশ পায় নাই।

মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত সব বইয়ের মধ্যে মেজর নাসির রচিত "যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা" একটি অসাধারন রচনা। অসাধারন এই কারনে, এই বইয়ে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি মানবিক দিক গুলিও ফুটিয়ে তুলেছেন। তার ভাষার ব্যাবহারও ঈর্ষনীয়। তিনি লিখেছেন শহীদ লেঃ বদিউজ্জামান (যার নামে শহীদ বদিউজ্জামান রোড) এর যুদ্ধ শেষ হবার প্রতীক্ষার কথা, লেঃ মোর্শেদ (পরর্বতীতে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ) এর প্রেমিকা তিতলী'র জন্য প্রতীক্ষার করার কথা, বিটুল'এর বড় বোনের কথা। এক পযায়ে তিনি লিখেছেন এক বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধার আকুতির কথা (সেই মুক্তিযোদ্ধার দুই সহযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত) যাতে তার বন্ধুদের জীবন বাঁচানো যায়। সেই দুই আহত মুক্তিযোদ্ধা কিছুক্ষন পরই মারা যান। আমাদের র্দূভাগ্য, মেজর নাসির এর মত মানবিক গুনসম্পন্ন অফিসারও কিন্তু সেই তিনজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন নাই বা করলেও হয়তো ভূলে গিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র বাম-পন্থীদের (বিশেষত চীন পন্থীদের) অবদান উপেক্ষিত হয়েছে বললে ভূল বলা হবে, মূক্তিযূদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, এমনকি আওয়ামি লীগ সদস্যদের; এক কথায় প্রায় সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও বীরত্ব'ও ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আমরা জাতিগতভাবে বড়ই দৈন্য অন্যের ত্যাগ বা বীরত্বের স্বীকৃতি জানাতে।

আমরা বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও অবদানের কথা জানতে পারি প্রধানত মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের আত্নীয়স্বজনের লেখা পড়ে। যেমন, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, একাত্তুরের গেরিলা জহিরুল ইসলাম বা মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলমের লেখা থেকে। একই ভাবে আমরা কাদেরিয়া বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত (এবং একইসাথে অতিরঞ্জিত) তথ্য পাই কাদের সিদ্দিকীর লেখা 'স্বাধীনতা ৭১' গ্রন্থ থেকে।

তাই এই সব বীরত্বগাথা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ নিজ উদ্যোগে তাদের কাহিনী প্রকাশ করা প্রয়োজন, তা ইন্টারনেটে, পেপারে বা বই হিসাবেই হউক না কেন। আর এখনও সময় আছে, সরকারীভাবে এই সব বীরদের স্বীকৃতি দেওয়ার।

পাদটিকাঃ এই ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কিছু নাই। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রধান কবি প্রয়াত শামসুর রহমান এর উদাহরন দেয়া যেতে পারে। কবি শামসুর রহমান'এর কবিতায় আমরা অনেক আগে থেকেই 'আসাদের শার্ট (৬৯ এর গন আন্দোলনে শহীদ) বা মাওলানা ভাসানীর 'সফেদ পাঞ্জাবীর' উল্লেখ দেখতে পেলেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্ম্পূন অনুপস্থিত এবং উপেক্ষীত! ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লিগ (২১ বছর পর) ক্ষমতায় আসার পর 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় প্রকাশিত কবিতায়, কবি শামসুর রহমান প্রথম বারের মত বঙ্গবন্ধুর কথা উল্লেখ করেন! 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র সেই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিল্পি কাইয়ুম চৌধুরী কতৃক আকা বঙ্গবন্ধুর জল রঙের ছবি ছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য, কবি শামসুর রহমান ১৯৭৫ এর পর বহু দিন 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন কিন্তু যে কারনেই হউক বঙ্গবন্ধু ১৯৯৬ পররযন্ত তার কবিতায় উপেক্ষিত ছিলেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "বেটার লেইট দ্যান নেভার"।

তথ্যসূত্রঃ

১। একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
২। একাত্তুরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম
৩। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম
৪। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম
৫। জনযুদ্ধের গনযোদ্ধা', মেজর কামরুল ইসলাম ভুইয়া
৬। একাত্তুর স্মরনে, ডা বেলায়েত হুসাইন
৭।একাত্তুরের জীবন যুদ্ধ, শামসুল ইসলাম সাইদ
৮। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম
৯। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১, সিডনী,